সমাজ, সংবাদ, সংলাপ

তৃতীয় সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা

সুকান্ত চৌধুরী

স্কুল অফ মিডিয়া, কম্যুনিকেশন অ্যান্ড কালচার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা
২০১৬

http://medianest.org.in

সমাজ, সংবাদ, সংলাপ

তৃতীয় সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায়
স্মারক বক্তৃতা

সুকান্ত চৌধুরী

প্রকাশক ঃ
স্কুল অফ মিডিয়া, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কালচার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা
২০১৬

http://medianest.org.in

প্রথম প্রকাশন ২০১৬

© যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় স্মারক সমিতির ওয়েবসাইট ঃ
www.medianest.org.in

প্রকাশক ঃ স্কুল অফ মিডিয়া, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কালচার
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা 700 032

মুদ্রক ঃ টাইপোগ্রাফিয়া
৩ বো স্ট্রিট, কলকাতা 700 012
মোঃ 9830105753
ই-মেল ঃ typographia.tga@gmail.com

http://medianest.org.in

টেলিভিশনের পরদায় ঝকঝকে, স্মিত এবং বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থিতি ছিল তাঁর। কিন্তু ২০১২ সালের ২ ডিসেম্বর আচমকা জীবনাবসান হয় টেলিভিশন সাংবাদিক সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায়ের। বয়স তখন মাত্র ৩৪।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের স্নাতক ছিলেন সন্দীপ্তা। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস কমিউনিকেশনে ডিপ্লোমা করার পর কাজ শুরু করেছিলেন একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলের হয়ে। ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে 'অ্যাঙ্কর' হিসাবে যোগ দেন তারা নিউজে। সেখানে 'প্রিয় বান্ধবী' নামে মেয়েদের একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা এবং স্ক্রিপ্ট লেখার সহ-দায়িত্ব ছিল তাঁর। ওই বছরের শেষের দিকে তিনি যোগ দেন স্টার আনন্দে (পরে এবিপি আনন্দ)। ডেপুটি প্রোডিউসার এবং 'অ্যাঙ্কর' সন্দীপ্তা সেখানেই কাজ করেছেন আমৃত্যু। দৈনন্দিন সংবাদ পরিবেশন ছাড়াও রাজনীতি, বিনোদন, বিজ্ঞান এবং খেলার 'শো' উপস্থাপনা করেছেন। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রচারকৌশল নিয়ে 'অন্য ভোট' নামে একটি সিরিজ প্রযোজনা এবং উপস্থাপনা করেছিলেন সন্দীপ্তা।

চূড়ান্ত পেশাদার সন্দীপ্তা সবসময়েই চেষ্টা করেছেন নিজেকে ছাপিয়ে যেতে। ভুল শুধরে আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠতে। শাস্ত্রীয় এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুরাগী সন্দীপ্তা ভালবাসতেন কবিতা, গাছপালা, মহাকাশ। ভালবাসতেন জীবনকে। প্রাণোচ্ছল, গভীর এক ব্যক্তিত্ব।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধুরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ মিডিয়া, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কালচারকে অনুরোধ করেন সন্দীপ্তার স্মৃতিতে বার্ষিক বক্তৃতার আয়োজন করার জন্য। স্থির হয় এই বক্তৃতার বৃহত্তর বিষয় হবে গণমাধ্যম এবং নীতিবোধ।

২০১৫ সালের ১০ ডিসেম্বর তৃতীয় সন্দীপ্তা চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরী। সেই বক্তৃতার প্রতিলিপি প্রকাশ করা হল স্কুল অফ মিডিয়া, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কালচারের তরফে।

http://medianest.org.in

প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজ ও তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে কর্মজীবন পালন করে সুকান্ত চৌধুরী এখন যাদবপুরের এমেরিটাস অধ্যাপক। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব কালচারাল টেক্সটস অ্যান্ড রেকর্ডসের প্রথম অধিকর্তা। তিনি অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে যুক্ত ছিলেন; তার মধ্যে আছে অক্সফোর্ডের অল সোলস কলেজ, কেম্ব্রিজের সেন্ট জনস কলেজ, লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব অ্যাডভান্সড স্টাডি, ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, আলবের্টা বিশ্ববিদ্যালয়, শিকাগোর লয়োলা বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী।

তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র ইংরেজি ও ইউরোপীয় রেনেসাঁস সাহিত্য ও সভ্যতা, এবং পাঠতত্ত্ব ও সম্পাদনা। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে *Infirm Glory: Shakespeare and the Renaissance Image of Man* (অক্সফোর্ড, ১৯৮১), *Renaissance Pastoral and its English Developments* (অক্সফোর্ড, ১৯৮৯) এবং *The Metaphysics of Text* (কেম্ব্রিজ, ২০১০)। তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের মধ্যে আছে *Pastoral Poetry of the English Renaissance* (ম্যাঞ্চেস্টার, ২০১৬) ও শেক্সপিয়রের *A Midsummer Night's Dream* নাটকের তৃতীয় আর্ডেন সংস্করণ (যন্ত্রস্থ)। তিনি আন্তর্জাতিক শেক্সপিয়র সংঘের কর্মসমিতির সদস্য।

সাম্প্রতিক কালে তিনি বৈদ্যুতিন মানবিক বিদ্যাচর্চা (ডিজিটাল হিউম্যানিটিজ) নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। 'বিচিত্রা' নামক রবীন্দ্ররচনার বৈদ্যুতিন রচনা সম্ভারের তিনি ছিলেন প্রধান নির্দেশক। ব্রিটিশ লাইব্রেরির Endangered Archives Programme-এর দুটি প্রকল্পের তিনি দায়িত্বে ছিলেন। তিনি মূলত বাংলা থেকে ইংরেজিতে, সেই সঙ্গে ইংরেজি ও ইতালীয় থেকে বাংলায় বহু রচনা অনুবাদ করেছেন। Oxford Tagore Translations এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতালীয়-বাংলা অনুবাদমালার তিনি প্রধান সম্পাদক। কলকাতা শহরের তৃতীয় শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে দুই খণ্ডে প্রকাশিত *Calcutta: The Living City* বইটিরও তিনি সম্পাদক ছিলেন। শিক্ষা, সমাজ, নগরজীবন ও পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি লেখেন ও আন্দোলনে অংশ নেন।

http://medianest.org.in

সমাজ, সংবাদ, সংলাপ

সুকান্ত চৌধুরী

আমার বিষয় সংবাদ ও সংবাদমাধ্যম। মাস্টারি ফলিয়ে তাই 'সংবাদ' শব্দটার অর্থ দিয়ে শুরু করি। 'সংবাদ'-এর মানে জিজ্ঞাসা করলে সকলেই বলবে 'কেন, খবর।' এটা কিন্তু আদি অর্থ নয়। সেই অর্থটা আমরা কার্যত ভুলে গেছি। নেহাত রবীন্দ্রনাথ দু-একটা কবিতার শিরোনামে ব্যবহার করায় মাঝে-মধ্যে মনে পড়ে, তাও সবসময় ঠিকমত ব্যাখ্যা করি কিনা সন্দেহ। 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' মানে তো কর্ণ আর কুন্তী সম্বন্ধে খবর নয়, কর্ণ আর কুন্তীর মধ্যে কথোপকথন, সংলাপ।

'সংবাদ' শব্দের দৈনন্দিন ব্যবহারে এই অর্থটা লুপ্ত বললেই চলে। কিন্তু কোনও শব্দের মূল অর্থ কখনও একেবারে হারিয়ে যায় না, লুকিয়ে থাকে ফের আবিষ্কারের আশায়। কথাটার দুটি মৌলিক ব্যঞ্জনা আজ আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই।

প্রথমটা এই, যে সংবাদ হল এমন একটা কিছু যা বলা হচ্ছে ঃ তথ্য নয়, উচ্চারণ। সংবাদের বস্তু বা বিষয় হতে পারে কোনও তথ্য বা বাস্তব ঘটনা। অমুক শহরে এতগুলি লোক আতঙ্কবাদীদের গুলিতে মারা গেছে, সংসদে অমুক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বা হতে পারেনি, অমুক দল অমুক ফুটবল প্রতিযোগিতায় জিতেছে — এগুলি সংবাদ নয়, ঘটনা বা ঘটনা সম্পর্কিত তথ্য। সেই তথ্য জড়ো করে ঝেড়ে-বেছে-সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করলে তবেই তা সংবাদ হয়। সংবাদসৃষ্টির তিন ধাপ ঃ ঘটনা, তথ্য, সংবাদ। যে ঘটনার কথা আমি জানতেই পারছি না, তা সংবাদ নয়, গ্রের বিখ্যাত কবিতায় মরুভূমির না-দেখা না-শোঁকা ফুল বা সমুদ্রতলের না-তোলা রত্নের মতো। সংবাদপত্র বা টিভি যখন সেই ঘটনার কথা আমাকে জানালো, যখন সেটা আমার জীবন স্পর্শ করল, তখনই সেটা সংবাদ হয়ে উঠল। গোলাপের দিকে চেয়ে বললাম, 'সুন্দর', সংবাদ হল সে।

এই অপটু তাত্ত্বিকতা এই মুহূর্তে আর কপচাবো না; বক্তৃতার শেষের দিকে আরও আটঘাট বেঁধে আলোচনায় নামব। তবে যা বললাম তা থেকে আপাতত ধরে নেওয়া যাক যে সংবাদ আদতে ঘটার ব্যাপার নয়, জানার বা বোঝার ব্যাপার, উপলব্ধি ও অনুভূতির ব্যাপার—বহির্জগতের নয়, মনের ও মগজের ব্যাপার, সেই সঙ্গে বাইরের নয় ঘরের ব্যাপার। ভিন্ন মহাদেশের ঘটনা আমার ঘরে পৌঁছলে তবেই সেটা সংবাদ।

http://medianest.org.in

আরেক ভাবে বললে, কোনও কিছু প্রেরিত ও গৃহীত হলে (communicated হলে) তবেই তা সংবাদ। 'মিডিয়া' বা 'মাধ্যম' শব্দগুলোর মধ্যে এই ধারণাটা নিহিত আছে। প্রায়ই আক্ষরিক অর্থে, সর্বদাই উপমা বা রূপকের স্তরে সংবাদ এক পক্ষ বলে, আরেক পক্ষ শোনে। কোনও কিছু বলা হলে বাচনভঙ্গীর প্রশ্ন ওঠে, দৃষ্টিকোণেরও। দু'জন মানুষ কখনও এক জিনিষ একভাবে দেখে না বা বলে না। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ পরিবেশকের অবস্থান, হয়তো বা খোলাখুলি স্বার্থ, যে কাজ করতে বাধ্য তা বলার অপেক্ষা রাখে না ঃ অসংখ্য ঘটনা অর্থাৎ সম্ভাব্য বিষয়বস্তু থেকে নির্বাচন, তারপর সেই নির্বাচিত বিষয়ের খুঁটিনাটি নির্বাচন, তারপর যে ভাষায় বা ছবিতে তা তুলে ধরা হবে তার নির্বাচন, এমন প্রতিটি স্তরে। এ-সব বহুচর্চিত বিষয়, নতুন করে আলোচনা করব না। কিন্তু ব্যাপারটার একটা অন্য মাত্রা আছে ঃ এই যে জনে-জনে পার্থক্য, তা কেবল সংবাদদাতা বা সম্প্রচারকের ক্ষেত্রে নয়, সংবাদের গ্রহীতা বা উপভোক্তার ক্ষেত্রেও বর্তমান। অর্থাৎ সম্প্রচারের উভয় প্রান্তে অশেষ ভেদ ও বৈচিত্রের সম্ভাবনা। সংবাদ সঞ্চালনের প্রক্রিয়াটা নিবিড়ভাবে দ্বিমুখী, সংলাপধর্মী, dialogic; তাও মাত্র দুটি নির্দিষ্ট পক্ষের আদানপ্রদান নয়, অস্থির বহুরূপী দুই প্রত্যক্ষের বিক্ষিপ্ত সংযোগ। সংবাদের বাস্তব ভিত্তি যাই হোক, সংবাদ হিসাবে পরিবেশিত হলে তার ধ্রুবত্ব প্রত্যয়িত হয় না, লোপ পায়; সেটা হয়ে পড়ে মানুষে-মানুষে বোঝাপড়ার ব্যাপার।

চলে এলাম 'সংবাদ'-এর আদি অর্থ 'সংলাপ'-এ। সংবাদ শুধু বাক্য বা উচ্চারণ নয়, দুই পক্ষের মধ্যে বাক্য বিনিময়। আমাদের অনেক গুরুতর সামাজিক প্রক্রিয়া আছে (হয়ত সবগুলিই আদতে তাই) যা মনে হয় একতরফা কিন্তু আসলে দ্বিমুখী, একটা বিনিময় বা বাণিজ্য। এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বক্তৃতা দেয়, বই লেখে, অভিনয় করে, নির্বাচনে দাঁড়ায়, আরেক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী যেন তা নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করে। কিন্তু এই আপাত অসম সম্পর্কে যে পক্ষের সক্রিয় ভূমিকা, সেও তা পালন করছে সেই নীরব, নিষ্ক্রিয় গ্রহীতার চাহিদা মেটাতে। সংবাদমাধ্যম আমাদের এমন সংবাদ পরিবেশন করে যা শুনতে আমরা অভ্যস্ত, নিয়মিত (conditioned), কোনও-না-কোনও স্তরে তলে-তলে ইচ্ছুক, স্বীকার না করলেও এমনকী, বুঝতে না পারলেও।

সংবাদের অভিজ্ঞ ব্যাপারীরা জানেন, কী খবর পাঠক-শ্রোতা-দর্শক শুনতে চায় — তাঁদের পেশাদারী পরিভাষায়, কোনটা পাবলিক খাবে। তার খানিকটা অবশ্যই মন হালকা বা খুশি করার খবর, যেমন খেলা বা বিনোদন বা বিখ্যাত

http://medianest.org.in

লোকদের ব্যক্তিগত জীবন; সবসময় কিন্তু তা নয়। জনজীবনের গুরুতর বিষয়ে যে খবর পরিবেশিত হয় তার বেশির ভাগটা রীতিমতো মন খারাপ করে তবু সেগুলি শুনতেই আমাদের আগ্রহ, ভালো খবর পেলে চট করে মানতে চাই না। দু-একটি কাগজ বা চ্যানেল তো "ভালো খবর" নামে একটা বিশেষ বিভাগ রাখে, "মানুষ কুকুরকে কামড়াল" গোছের, এবং সেটা বরাবর হয় খুব সংক্ষিপ্ত।

যে সংবাদ রোজ আমাদের দোরগোড়ায় আছড়ে পড়ে, তার অধিকাংশই খারাপ খবর। তবু আমরা উদ্গ্রীব হয়ে পড়ি। তার একটা কারণ অবশ্যই এই যে এসব কথা জানা দরকার, সতর্ক থাকতে বা নিজেদের সুরক্ষিত করতে। আজকের দুনিয়ায় বাঁচতে গেলে এ-সব না জানলেই নয় — সব কিছুর সঙ্গে সব কিছুর যোগ, প্যারিস আর খাগড়াগড় এক সুতোয় বাঁধা পড়া মোটেই অসম্ভব নয়। এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে, এমন খবর যে আদৌ প্রচারিত হতে পারছে, সেই গণতান্ত্রিক আশ্বাসটুকু উপভোগ করে প্রতিকারের আশা বাঁচিয়ে রাখা। এই খবর পরিবেশন করা সংবাদমাধ্যমের সামাজিক ও নৈতিক কর্তব্য, তা নিয়ে বেশি বলার দরকার নেই। যেটা বলার, তা হল ধারাবাহিকভাবে এমন খবর পড়ে-শুনে-দেখে, আর নিজস্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার বিলক্ষণ মিল পেয়ে, গ্রাহক সেটাই প্রত্যাশা করে, সংবাদমাধ্যমগুলি সেই চাহিদা পূরণ করে। হতাশার অন্য মুখ যে সিনিসিজমের বর্ম আমরা প্রায় সকলেই অল্পবিস্তর ধারণ করি, সংবাদের বাচনরীতিও সেটা অবলম্বন করে আর গ্রাহকের মনে আরও ঘনীভূত করে। এই অবস্থার দায় না গ্রাহকের না সাংবাদিকের; দায় সমাজের এবং বিশেষ করে সমাজের শাসক ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর। কিন্তু কারণ যাই হোক, দোষ যারই হোক, এভাবে সংবাদমাধ্যম ও গ্রাহকদের মধ্যে এক ধরনের আপসে খেলা চলতে থাকে। নানা রকম খবরের মধ্যে এগুলি প্রাধান্য পায় কেবল সঠিক বলে নয়, গুরুতর বলেও নয় (যদিও প্রায়ই তা সত্যিই গুরুতর); প্রাধান্য পায় প্রত্যাশিত বলে। গ্রাহকের যা প্রত্যাশা বা অবচেতন চাহিদা, মাধ্যমগুলি তারই জোগান দিয়ে চলে, দু'পক্ষের সম্পর্ক একটা চক্রাকার আবর্তে পড়ে যায়। তাদের সংলাপটা আর সংলাপধর্মী থাকে না, dialogic হয় না — না থাকে তার দ্বৈত পারস্পরিক চরিত্র, না থাকে জিজ্ঞাসা করা বা খুঁটিয়ে দেখার মেজাজ। বরং উভয় পক্ষ একই পংক্তিতে বসে যুগ্ম অবস্থানটা আরও কায়েম করে তোলে।

প্রক্রিয়াটা আমি বর্ণনা করছি শুধু, সমালোচনা করছি না, যদিও বর্ণনার মধ্যে একটা নঞর্থক সুর এড়ানো অসম্ভব। সমাজ ও শাসকশ্রেণির ব্যর্থতা ও অপকীর্তি জনসমক্ষে তুলে ধরা সংবাদমাধ্যমের একটা প্রধান কর্তব্য। সেই কর্তব্য পালনের

http://medianest.org.in

স্বাধীনতা বিশ্বের বহু দেশে, হয়তো অধিকাংশ দেশেই নেই। আমাদের যে এখনও প্রায় সর্বাংশে আছে, সেজন্য আমাদের স্বস্তি ও গর্ব বোধ করা উচিত, তা নিয়ে কোনও নেতিবাচক মন্তব্য চট করে করা উচিত নয়; আর বলা বাহুল্য, সেই স্বাধীনতা খর্ব করার সামান্যতম উদ্যোগ প্রতিরোধ করা উচিত। কিন্তু আরও গভীর স্তরে যে প্রশ্নটা তুললাম, সেটা থেকেই যাচ্ছে। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে যদি সংবাদমাধ্যম সমাজের অশুভ ধারাগুলো প্রত্যয়িত করে কেবল, লোকচক্ষে আরও অবধারিত করে তোলে, তার সেই ভূমিকায় আমরা কতটা মূল্য অর্পণ করব? আরও কিছু, অন্য কিছুও কি আমাদের দাবি করা উচিত নয়?

এই 'আরও কিছু', 'অন্য কিছু'র (something plus) এক উদ্বেগজনক নজির কিন্তু সংবাদমাধ্যমে, বিশেষত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে অতিদৃশ্যমান। খবর হলেই কোনও ব্যক্তি বা ঘটনা একটা বিশেষ মাত্রা পায়, ক্রমাগত খবর হতে থাকলে তা একটা অতিবাস্তব বা অতিমানবীয় (larger than life) পর্যায়ে পৌঁছায়। সংবাদমাধ্যমে পরিবেশিত হওয়া মানেই এক ধরনের প্রচার। রবীন্দ্রকাব্যের উপর আরেকটু হামলা করে, আমার আগের বিকৃত উদ্ধৃতিটা উলটিয়ে বলা চলে, ''গোলাপের দিকে চেয়ে বললাম, 'সংবাদ', সুন্দর হল সে।'' অসুন্দরও হতে পারে — গোলাপ যে একটা কুশ্রী দুর্গন্ধ আগাছা, এমন ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার গোয়েবেলসীয় প্রচেষ্টায় যে মাধ্যমগুলি কখনও নামে না, তাদের অতি বড় সমর্থকও তা বলবে না। আমি কিন্তু এমন সরাসরি মিথ্যাচারের কথা বলছি না। বলছি যে সংবাদরূপে কোনও কিছু পরিবেশিত হলে সেই কারণেই, অর্থাৎ আদৌ প্রচারিত হওয়ার কারণেই, সেটা একটা বিশেষ গুরুত্ব পায়। যা পরিবেশিত হয়নি বা অল্প মাত্রায় হয়েছে তার তুলনায় তো বটেই, আমাদের নিজেদের বাস্তবলব্ধ অভিজ্ঞতার চেয়েও তা ওজনে বেড়ে যায়। এভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা বিকৃতি বা অসামঞ্জস্য ঢুকে পড়ে, আমাদের পরিমিতিবোধ ও মূল্যবোধ ক্ষুণ্ণ হয়।

আগে বলেছিলাম, সমাজের আপামর অধিবাসীদের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সম্পর্ক অবশেষে আদান-প্রদান বা আন্তঃক্রিয়ার। কথাটা খানিক সংশোধন করে এখন বলছি, আদান-প্রদানটা সমানে-সমানে হয় না, মাধ্যমগুলি গ্রাহকদের উপর একটা বাড়তি প্রভাব বিস্তার করে। সেই প্রভাবটা প্রায়ই গঠনমূলক এমনকী, শুভ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। মাধ্যমগুলির যদি সরাসরি কোনও রাজনৈতিক বা অন্য উদ্দেশ্য নাও থাকে, তারা কাজ করে বিজ্ঞাপনদাতা অর্থাৎ অর্থের জোগানদারের আদর্শ খরিদ্দার এক উপভোক্তাশ্রেণি গড়ে তোলার পক্ষে কার্যকর মত ও রুচিকে প্রশ্রয় দিতে, নয়তো নিছক নিজেদের কাজ সহজ করার জন্য গ্রাহকদের

http://medianest.org.in

কয়েকটি অভ্যস্ত চাহিদায় আবদ্ধ রাখতে। (সরকারও এই বিচারে বিজ্ঞাপনদাতা বা পৃষ্ঠপোষক, যদিও তার আদর্শ গ্রাহকের সংজ্ঞা কিঞ্চিৎ ভিন্ন।) অধিকাংশ গ্রাহকও ভাবেন, সংবাদমাধ্যম তাঁদের পোশাকি সমাজচেতনায় সুড়সুড়ি দিলে মন্দ নয়, সত্যি-সত্যি ভাবিয়ে তুলে অস্বস্তিতে ফেললে বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

শেষ বিচারে জনগণের চোখে সংবাদমাধ্যম হল অবকাশরঞ্জনের উপায়। পাঠ্য মাধ্যম সম্বন্ধেও কথাটা খাটে। সকালে খবরের কাগজটা অধিকাংশ পাঠকের কাছে চায়ের সঙ্গে বিস্কুটের পরিপূরক; আমাদের সবচেয়ে সিরিয়াস কার্যকলাপের মধ্যে কাগজ পড়াটা আমরা কেউই ধরি না। বৈদ্যুতিন মাধ্যম তো আরও অনেক দূর এগিয়ে, সার্বিক ভাবমূর্তিতে কার্যত বিনোদনের পসারি। তার একটা কারণ, কোনও কিছু পড়তে গেলে কিয়ৎমাত্রায় সক্রিয় সজাগ থাকতে হয়, শুনতে বা দেখতে শক্তির সেই অপচয়টুকু করতে হয় না। বিনোদনের এই বাতাবরণে সংবাদ চ্যানেলগুলিও পড়ে যায় infotainmentএর ছাঁদে। এ-সব অতি পরিচিত কথা, আলোচনা করে কালক্ষেপ করব না।

এখানে এবং আমার বক্তৃতার আগাগোড়াই আমি কিন্তু সংবাদমাধ্যমের অপব্যবহারের কথা বলছি না, মাধ্যমগুলির নিহিত স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলছি, ভালোমন্দ সব প্রয়োগেই যা উপস্থিত। আর উপস্থিত বলেই তার একটা শুভ সামাজিক প্রয়োগও হয়তো অসম্ভব নয়। প্রশ্নটা নতুন নয়। সওয়া চার শ' বছর আগে ফিলিপ সিডনি অনুরূপ চিন্তার অবতারণা করেছিলেন কাব্যের উপকারিতা প্রসঙ্গে। তাঁর উত্তরটা ছিল, মাধ্যম হিসাবে কাব্য দর্শনশাস্ত্রের মতো অত গুরুগম্ভীর নয় বলেই তার সিরিয়াস প্রয়োগ আরও সার্থক হতে পারে ঃ লোকে তা আগ্রহ দিয়ে শোনে। কবি আমাদের সামনে আসেন এমন এক চিত্তাকর্ষক কাহিনি নিয়ে, যাতে মশগুল হয়ে শিশুরা খেলা ভুলে যায়, বৃদ্ধেরা শীতের দিনে আগুনের পাশ ছেড়ে উঠে আসে। অন্তত শিশুদের ক্ষেত্রে একই ফল যে টিভিও উদ্রেক করে তা আমরা বিলক্ষণ জানি, আর আগুনের ধার থেকে তো ওঠার দরকারই পড়ে না।

অতএব একটা কাল্পনিক উদাহরণ ধরা যাক। আমরা তো নিত্য দেখছি, প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যখন বিলেত-আমেরিকা-জাপান-সিঙ্গাপুর প্রভৃতি কোনও সুরম্য দেশে যান, সঙ্গের সাংবাদিকের দল শুধু নেতাদের কর্মসূচিই রিপোর্ট করেন না, ঐসব দেশের দৃশ্য, হালচাল, খাদ্য, পোশাক এমনকী, রেল স্টেশন চিড়িয়াখানা সব কিছুর চিত্রায়িত প্রতিবেদন পেশ করেন। দেশের দর্শকবৃন্দ তা দেখে ঘরে বসে বিদেশ ভ্রমণের আনন্দ উপভোগ করেন। এই মুহূর্তে প্যারিসে বিশ্ব পরিবেশ সংক্রান্ত শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাতে যতগুলি তাবড়

http://medianest.org.in

নেতা একত্র হয়েছেন তা প্রায় কোথাও দেখা যায় না। তাঁদের আলোচ্য বিষয়ও প্রায় অন্য যে-কোনও বিষয়ের চেয়ে গুরুতর। প্যারিস অতি মনোরম শহর, শিল্প-সংস্কৃতিতে বিশ্বের অন্যতম প্রধান প্রাণকেন্দ্র। তায় আবার অল্পদিন আগে সেখানে অন্যরকমের বড় মর্মান্তিক সংবাদ সৃষ্টি হয়েছে। এত সত্ত্বেও দেখা গেল না, আমাদের রাজ্যের কোনও চ্যানেল এই উপলক্ষে সেখানে কোনও প্রতিনিধি পাঠিয়েছে, ভের্সাই-ল্যুভ্র-আইফেল টাওয়ারের পাশাপাশি তুলে ধরেছে শীর্ষ নেতাদের আলোচনা, সারা বিশ্ব থেকে জড়ো হওয়া পরিবেশ কর্মীদের মিছিল, বা এ-সবের পিছনে পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্য ও পর্যালোচনা। এটা কিন্তু করা যেত। এত গুরুতর একটা বিষয়ে (যা নিয়ে জনসাধারণ আজ এমনিতেই যথেষ্ট সচেতন) দর্শকদের নিবিষ্ট করা অসম্ভব ছিল না, অসম্ভব ছিল না ইনফোটেনমেন্টের মোড়কেই ব্যাপারটা মুড়ে দেওয়া। কিন্তু তা হয়নি।

দৃষ্টান্তটা হয়তো একটু মোটা দাগের হয়ে গেল। আধুনিক সংবাদমাধ্যমকে যেন আমি সরল শিক্ষামূলক একটা ব্যবস্থা বলে মনে করছি। ফিলিপ সিডনির কাব্যতত্ত্বও যেমন আজকের দিনে অতি সরল মনে হবে, তেমনই সংবাদমাধ্যমের ক্ষেত্রে আমার এই উদাহরণ। আরও সূক্ষ্ম চেতনার দ্যোতক কোনও পরিবর্তনের কথা ভাবা যায় কি?

মুশকিল হল, এমন কোনও পরিবর্তনের জল্পনা করতে গেলে মাধ্যমটারই একটা মৌলিক পরিবর্তন দাবি করতে হয় — মননের একটা গাঠনিক রূপান্তর, অপব্যবহৃত শব্দটির সঠিক প্রয়োগেই paradigm shift। এমন রূপান্তর প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্য থেকে উঠে আসতে পারে না। সমাজ ও সংবাদমাধ্যমের মধ্যে যদি একটা নতুন সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, দুইয়ের সংলাপে নতুন প্রাণসঞ্চার করতে হয়, তার উৎস খুঁজতে হবে সেই মাধ্যমের গণ্ডীর বাইরে।

এ প্রসঙ্গে ভাবার অবকাশ আছে, সংবাদমাধ্যমকে যে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে কেবল আজ নয়, অন্তত দুই শতক ধরে গণ্য করা হচ্ছে, তার ভিত্তি কী। Fourth estate আখ্যাটা সম্ভবত প্রথম আরোপ করেছিলেন এডমন্ড বার্ক, ১৭৮৭ সালে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই কথাটা যথেষ্ট চালু হয়ে গিয়েছিল। সে যুগে সংবাদমাধ্যম বলতে সংবাদপত্র, তার দীর্ঘ ধ্রুপদী ঢং আজকের পাঠকের কাছে অসহনীয় মনে হবে, তখনও খুব অল্প লোকের মনে প্রভাব বিস্তার করত। (অবশ্য সেই অল্প লোকই ছিলেন প্রভাবশালী, বলতে গেলে সমাজটা তাঁরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন।) Fourth estate-এর আদি তাৎপর্য, ব্রিটিশ সংসদ যে তিন estate অর্থাৎ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত (উচ্চবংশীয়, যাজক সম্প্রদায়

http://medianest.org.in

ও সাধারণ্য), তার বাইরে একটা আলাদা শক্তি। এখন কথা হল, সাংবাদিকরা তো এই তিন গোষ্ঠীর বাইরে ছিলেন না, প্রায় সকলেই ছিলেন সাধারণ্য বা commons এর অন্তর্ভুক্ত। সাংবাদিক হওয়ার দৌলতে তাঁদের—এবং সব পেশার মানুষের মধ্যে একমাত্র তাঁদের — একটা দ্বিতীয় পরিচয় আরোপ করা হল। সাংবাদিকতা যেন একটা বিশেষ গুণ বা মহিমা, ব্যক্তিপরিচয় এমনকী, সাধারণ শ্রেণিগত পরিচয়ের বাইরে তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব।

প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সংবাদপত্রের এই মিস্টীক বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বলা বাহুল্য, আমূল পরিবর্তন ঘটেছে সংবাদ পরিবেশন যখন পাঠ্য মাধ্যম থেকে বিস্তার লাভ করল শ্রুতি ও দৃশ্যের জগতে। এতে সংবাদ একটা অভূতপূর্ব প্রত্যক্ষতা ও তৎকালীনতা লাভ করল, হাতে–গরম হয়ে উঠল বলা যায়। অথচ সেই প্রত্যক্ষতা হল অশরীরী, স্থানকালজয়ী ঃ সংবাদের আদি সূত্র থেকে দূরে অথচ একই উপস্থিতি ও তাৎপর্য নিয়ে আমাদের কাছে হাজির। এম.ভি. গোপালস্বামী হয়তো এত কিছু ভেবে ভারতীয় বেতারের নাম 'আকাশবাণী' দেননি, কিন্তু নামটা বিশেষভাবে জুতসই। সংবাদমাধ্যমের যে অতিমানবিকতার কথা আগে বলেছি, শ্রুতদৃশ্য মাধ্যমে তা আরও অতিকায় মাত্রা পেল। যতদিন সংবাদমাধ্যমের এই অতিবাস্তব ভাবমূর্তি বজায় থাকবে, ততদিন তা চলবে নিজের পথে স্বমহিমায়, তার প্রভাব হবে অপরিমিত।

এখানেই খুব সাম্প্রতিককালে চিত্রটা আমূল বদলাতে শুরু করেছে আরও একটা যুগান্তকারী পটপরিবর্তনে, আরেকটা paradigm shift-এর ফলে। একটা শব্দ আমি ইচ্ছা করেই এতক্ষণ বলতে গেলে ব্যবহার করিনি, সেটা 'মিডিয়া' ঃ আগাগোড়া বলেছি সংবাদমাধ্যমের কথা। বলা বাহুল্য, মিডিয়া মাত্রেই সংবাদমাধ্যম নয়, সেটা হল news media। মিডিয়া শব্দের কোনও বাংলা প্রতিশব্দ নেই। আরও বিপত্তি এই যে 'মিডিয়া' আদতে বহুবচন হলেও কবেই একবচন হয়ে গেছে, data র মতো। Data, media দুটি শব্দই যোগাযোগের একটা নতুন যুগের প্রতিপাদ্য, যার দুই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল কম্পিউটার আর বৈদ্যুতিন যোগাযোগ মাধ্যম। প্রযুক্তির এই নতুন দিগন্ত খুলে যাবার পর বার্তা প্রেরণ ও বিনিময়ে যে বিপ্লব ঘটে গেছে, তা অন্য সব কার্যক্ষেত্রের মতো এখানেও সব অভ্যাস সব ভাবনাচিন্তা ওলট-পালট করে দিয়েছে। আলোচনার এই নতুন পর্যায়ে তাই 'সংবাদ'-এর বদলে 'বার্তা' শব্দটা ব্যবহার করছি।

আমার আলোচনায় এই বিপ্লবের যে দিকটা প্রাসঙ্গিক, তা বার্তা বিনিময়ের জন্য পূর্বে অচিন্তনীয় কিছু নতুন মাধ্যমের উদ্ভাবন, যাকে আমরা বলি social media।

http://medianest.org.in

(আপাতত ইংরেজি নামটা ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই।) তথ্য ও বার্তার বাহন হিসাবে সাবেক বৈদ্যুতিন মাধ্যম আর social media র একটা মাঝামাঝি জায়গায়, যেন দুটোর লক্ষণের সমন্বয় ঘটিয়ে, আছে আন্তর্জাল বা ইন্টারনেট। আন্তর্জাল তো একটা একক সংহত মাধ্যম নয়, অসংখ্য আলাদা-আলাদা ও প্রবলভাবে ভিন্নধর্মী সূত্রের সমষ্টি। তার পর্যবেক্ষণ আলাদাভাবে করতে হয়, হচ্ছেও ব্যাপকভাবে। আন্তর্জাল নিয়ে আমি কোনও কথা বলব না, কারণ তাতে আলোচনাটা একেবারে ঘেঁটে যাবে। সোজা চলে আসব social media তে।

Social mediaর বিপ্লবটা এখানে, যে তা বার্তা বিনিময়ের প্রাতিষ্ঠানিক মাধ্যমগুলো সম্পূর্ণ এড়িয়ে, সাবেক ব্যবস্থায় যারা ছিল সম্প্রচারের একতরফা গ্রাহক, তাদের মধ্যে সরাসরি যোগস্থাপন করছে — তারা এখন সক্রিয়ভাবে পরস্পরের মধ্যে বার্তাবিনিময় করছে অর্থাৎ বার্তার উৎস বা সঞ্চারক হিসাবেও কাজ করছে, কেবল গ্রহীতা হিসাবে নয়। এতে তাদের একটা সম্মিলিত প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় সৃষ্টি হচ্ছে, খানিকটা fourth estateএর আদলে কিন্তু আরও অনেক বিশাল জনসংখ্যা জুড়ে। আজকাল ছোটবড় কোনও ঘটনার আলোচনায় কেবল প্রাতিষ্ঠানিক সংবাদমাধ্যমগুলি কী বলল তা নয়, ফেসবুক ও টুইটারের মন্তব্যের ধারাও আলোচনা করা হয়, প্রচলিত মাধ্যমগুলিই করে। বিশেষত বৈদ্যুতিন মাধ্যমে তো পরদার নীচে বা এক পাশে দর্শকদের টুইটগুলো রীতিমতো তুলে ধরা হয়। অর্থাৎ সাবেক মাধ্যমগুলি সচেষ্ট, নতুন মাধ্যমের আপাত বিরুদ্ধগামী ধারাও তাদের আওতায় নিয়ে আসতে, বা অন্তত তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে। পাশাপাশি, social mediaর উদ্ভাবক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে নতুন একপ্রস্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে যা আরও বহুগুণ — প্রায় অকল্পনীয় মাত্রায় — অতিকায়, অদৃশ্য, সর্বত্রগামী, বাস্তবে না হোক সম্ভাবনার নিরিখে ভয়াবহ। সৌভাগ্যক্রমে তা আমার আলোচনার বিষয় নয়।

সাবেক সংবাদপত্রে পাঠকের বক্তব্য প্রকাশের সামান্য অবকাশ ছিল 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে। বৈদ্যুতিন মাধ্যমে (তাকেও 'সাবেক' পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হয়) গ্রাহকের সক্রিয় ভূমিকা বেড়েছে, ফোন-ইন প্রোগ্রাম প্রভৃতি এমনকী, ফেসবুক-টুইটারের কল্যাণে। আর social media সাংবাদিক বা সংবাদ-সরবরাহকারী এবং গ্রাহক — এই দুই পক্ষের মধ্যে তফাৎটা লোপ করে দিয়েছে ঃ সকলেই হতে পারে বার্তার উৎস, তারপর পারে তা বাড়াতে-কমাতে-বদলাতে, তা নিয়ে মন্তব্য করতে। যে কোনও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের এটাই মৌলিক পরিবেশ বা প্রণালী, default mode ঃ ব্যাপারটা একতরফা

http://medianest.org.in

করতে চাইলেই বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হয়। অর্থাৎ 'সংবাদ'-এর মৌলিক লক্ষণ যে 'সংলাপ', social mediaতে তা সত্যি-সত্যি উপস্থিত। উপস্থিত আরেকটা লক্ষণও, তা হল বাচন বা উচ্চারণ। Social mediaতে সকলে আক্ষরিক অর্থে 'স্বচ্ছন্দে', নিজের ছন্দে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। তাই সেখানে, বা এমনকী ই-মেলে ভাষার ব্যবহারটা হয় অনেক সহজ সাবলীল, তাতে পরিমার্জনার মাত্রা কম বা অনুপস্থিত, কথ্য ভাষার মতো।

Social media নিয়ে আমার এ পর্যন্ত আলোচনা বড় সরল রয়ে গেল। অথচ অবস্থাটা আদতে জটিল, জটিল এক নতুন স্তরে ও মাত্রায়। আপাত অবাধ বিনিময়ের আড়ালে — বা বলা ভালো আরও উপরে বা দূরে অন্য এক স্তরে — আর কিছু না হোক প্রযুক্তিগত কারণেই কাজ করছে একতরফা অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ ও সম্ভাব্য নজরদারি। Social mediaর অংশগ্রহণকারীদের ব্যক্তিসত্তাও বিচিত্র ও স্ববিরোধী। সাবেক সংবাদমাধ্যমে, বিশেষ মুদ্রণমাধ্যমে, গ্রাহকবৃন্দ (জনসাধারণ, পাবলিক) ছিল নামহীন অবয়বহীন একটা সমষ্টিমাত্র। Social mediaতে একদিকে তারা আরও বহুগুণ বিশাল একটা সমষ্টির অঙ্গমাত্র, গুগল সার্ভারের নগণ্য কয়েকটা অতি-সংক্ষেপিত (compressed) বাইট। অথচ কাছের দৃষ্টিতে তাদের ব্যক্তিসত্তা অক্ষুণ্ণ এমনকী, বর্ধিত, যা অন্য কোনও মাধ্যমে এত অবাধ ও ব্যাপকভাবে স্বপ্নেও হতে পারত না। এই দ্বৈত পরিচয়েই social mediaর আকর্ষণ।

বিপদটা কোথায়? এখনই যে বিপদের কথা বললাম, সেটা এই কারণে যে আমাদের জীবনের প্রায় সব ঘটনা, কার্যকলাপ, আদানপ্রদান উঠে যাচ্ছে সুদূর সার্ভারে অজানা দৃষ্টির গোচরে। কিন্তু আজ তা আমার আলোচ্য নয়। আমার নিবেদনে যেটা প্রাসঙ্গিক, সেটা আরও নিকটের সামাজিক ও মানসিক কিছু প্রতিক্রিয়া।

Social mediaতে যে-সব ঘটনার আলোচনা হয় তার একটা অংশ বৃহত্তর জগতের ঘটনা, তার উৎস সাবেক সংবাদমাধ্যম বা আন্তর্জাল। আর একটা অতিবৃহৎ অংশ ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা, প্রায়ই অকিঞ্চিৎকর ঘটনা। ফলে সাবেক মাধ্যমের যে সমস্যাগুলি আগে তুলে ধরেছি, এই ব্যক্তিগত মাধ্যমে তা উৎকটভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। একান্ত ব্যক্তিগত কোনও প্রসঙ্গ বোঝাতে আমরা কথায় বলি 'হাঁড়ির খবর', বলি 'কী দিয়ে ভাত মেখে খাচ্ছি'। ফেসবুকে কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোক আক্ষরিক অর্থেই সেইসব খবর স্বেচ্ছায় দুনিয়ার সামনে তুলে ধরছে। ব্যক্তিগত প্রেক্ষিতেও যা তুচ্ছ তাৎক্ষণিক, তাতে একটা সামাজিক মাত্রা আরোপ

http://medianest.org.in

করা হচ্ছে। যে অতিমাত্রা বা অতিকায়ত্বের কথা বলছিলাম তা আরও উৎকটভাবে দেখা দিচ্ছে, লঘুগুরু জ্ঞান লোপ পাচ্ছে। বিশেষত আমাদের মতো দেশে, যেখানে ফেসবুক-টুইটারের নাগাল সমাজের একটা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অংশে আবদ্ধ, সেখানে জনমানসের নির্ধারক বা প্রতিফলন হিসাবে social mediaর সদর্থক ভূমিকা থাকতে পারে, যেমন নির্ভয়াকাণ্ডে বা 'হোক কলরব' আন্দোলনে। আমলাশোলে অনাহার বা চা-বাগানের মৃত্যুমিছিল প্রতিরোধে social media প্রায় অবান্তর, অন্তত যতদিন না এই মাধ্যমের অংশীদারদের সামাজিক মমত্ববোধ আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বরং social mediaয় প্রতিফলিত হচ্ছে না বলে এগুলি আরও বেশি করে অবহেলিত হওয়ার ঘোর সম্ভাবনা।

এটা না হয় একটা দেশের বিশেষ সমস্যার কথা, যদিও পৃথিবীতে এমন দেশই সংখ্যায় বেশি। Social mediaর আরেকটা সাধারণ নিহিত সমস্যা নিয়ে কিন্তু সারা বিশ্বের সমাজবিদ ও মনোবিদরা বিশেষ চিন্তিত, তা হল এই মাধ্যমগুলির virtual চরিত্র — বাংলায় হয়তো বলা যায় 'নয়-বাস্তব'। বৈদ্যুতিন প্রযুক্তির মধ্যস্থতায় social mediaর অংশীদাররা চেতনার একটা একেবারে ভিন্ন স্তরে, বলা যায় ভিন্ন জগতে, স্থানান্তরিত হয়। সেই স্থানটাও একটা না-স্থান, ভূগোলের বাইরে অবস্থিত। অবশ্যই এটা হয় কারও বেশি কারও কম — অধিকাংশের মধ্যে এত অল্প মাত্রায় যে নজরে আসে না, বা সকলের মধ্যেই খানিক উপস্থিত থাকায় স্বাভাবিক মনে হয়। শ্রোতাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিশ্চয় ফেসবুক-টুইটার করেন, তাঁরা আমার কথা শুনে ভাবছেন, 'কই, আমাদের তো এমন কিছু হয়নি।' আপনারাও কিন্তু অজান্তে সাইবার-রাজ্যের দ্বৈত-নাগরিকত্ব নিয়ে ফেলেছেন। ভাবুন তো, ফেসবুকে আপনারা যত সহজে যত লোকের কাছে নিজের সম্বন্ধে যত কিছু জানান, প্রাক্-ফেসবুক যুগে বলতেন কি, বা এখনো ফেসবুকের বাইরে বলেন কি? আসল জীবনে এত সহজে কাউকে আপনার 'বন্ধু' বলে কবুল করেন? ফেসবুকে তেমন বলেন বা করেন কারণ তার জগৎটা দৈনন্দিন বাস্তবের বাইরে একটা 'যদি হতো'র জগৎ, সেটা হঠাৎ আসল হয়ে ওঠায় আমরা উৎফুল্ল ও হয়তো অতি-উদগ্রীব, কারণ অনেক কিছু যা আমরা বলতে চাই কিন্তু বাস্তবে পারি না, তা এই মাধ্যমে বলা যায়। এটাকেই বলছি 'নয়-বাস্তব'। নয়-বাস্তব অবাস্তব নয়, একটা বিকল্প বাস্তব অথবা বাস্তবের বিকল্প (দুটো শব্দবন্ধের মানে এক নয় কিন্তু)। দুটো বাস্তবের বোঝা একসঙ্গে সামলানো চাট্টিখানি কথা নয়।

আমরা তো জানি, ফেসবুক-টুইটারের যত অংশীদার, তাদের একটা

http://medianest.org.in

অননুমেয় অংশের প্রকৃত অস্তিত্ব নেই, নাম-ধাম-পরিচয় একেবারে কাল্পনিক। প্রশ্ন করতেই হয়, যে নামগুলির পিছনে একটা রক্তমাংসের মানুষ আছে, তারাও কতদূর একটা কাল্পনিক বা নির্মিত পরিচয় অবলম্বন করছে। সাবেক সাহিত্যতত্ত্বে আত্মজীবনীর রচয়িতা সম্বন্ধে এ ধরনের প্রশ্ন করা হত — তিনি কি স্বসৃষ্ট আখ্যানের কাল্পনিক চরিত্র হয়ে উঠেছেন?

প্রশ্নটা গুরুতর, কারণ ফেসবুক-টুইটার অতিক্রম করে সাইবারস্পেসের একটা বিশাল মহাদেশ আছে, যার অভ্যন্তরে পাড়ি দিলে নানা পন্থায় পরিচয় আরও বিপুলমাত্রায়, হয়তো পুরোপুরি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা পরিচয়, জীবন এমনকী, সমাজে ঢুকে পড়া যায়। ছদ্মবেশের উপমা যথেষ্ট নয়, পুনর্জন্মের উপমাই এক্ষেত্রে উপযুক্ত। এই প্রণালীগুলি অত্যন্ত জটিল কমপিউটার গেম ঃ massively multiplayer online role-playing games (MMORG)। তার কতগুলি একটা কাল্পনিক জগতের প্রেক্ষাপটে বসানো, যেমন Star Wars বা World of Warcraft। (নামেই প্রকাশ এগুলির অতিরিক্ত বিপদ, জঙ্গিয়ানার স্পষ্ট উসকানি।) কতগুলি কিন্তু বাস্তবের ঘোষিত বিকল্প, সর্বোপরি Second Life, যার প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা দাবি করেন এটা কম্পিউটার গেম নয়, তারও বাড়া একটা কিছু। বলা বাহুল্য, এই গেমগুলিতে সংলাপের মাত্রা লোপ পেয়েছে, কারণ এ জগতে দ্বিতীয় কোনও রক্তমাংসের মানুষ নেই যার সঙ্গে সংলাপ চালানো যায় — চরিত্রগুলি কেবল কাল্পনিক নয়, স্বকপোলপ্রসূত। কিন্তু তা সৃষ্টি করার আপাত স্বাধীনতাও সীমিত, সেই গেমের সুদূর স্রষ্টা প্রোগ্রামের ভিতর কী ঢুকিয়েছে তার দ্বারা।

এসব প্রণালী অবশ্যই social media নয়, কিন্তু প্রচলিত নিরীহ social media- তেও এর বীজ লুকিয়ে আছে। যে মাধ্যম সামাজিক সংলাপের চূড়ান্ত প্রকাশ, সেটাই আমাদের পথ ভুলিয়ে নিয়ে যেতে পারে একটা সংলাপহীন আত্মনিমজ্জিত জগতে। প্রযুক্তির সীমাবদ্ধতার জন্যই সাবেক মাধ্যমগুলো বাস্তববর্জিত যে চিত্র তুলে ধরত, তা ছিল সরলভাবে অবাস্তব। কিন্তু ঐ যা বললাম, নয়-বাস্তব তো অবাস্তব নয়; তা বাস্তব জীবনের এক ধরনের পুনর্সৃষ্টি, যাতে অভ্যস্ত সামাজিক সম্পর্কের শুধু পুনর্বিন্যাস নয়, অবলুপ্তি ঘটার সম্ভাবনা। তার জায়গায় কী আসবে, তা এখনও বলতে গেলে অনুমানের অতীত।

যা অনুমান করাই দুষ্কর তার আলোচনা নিষ্ফল হতে বাধ্য। এটুকু বলা যায়, নিছক পশ্চাদগমন কোনও সমাধান নয়। আমার ছেলেবেলায় বলা হতো, দুনিয়ার খবর জানতে (আর অবশ্যই ভালো ইংরেজি শিখতে) একটি বিশেষ সংবাদপত্র

http://medianest.org.in

পড়া আবশ্যক। আজ এমন উপদেশ শুনলে সায়েন্স সিটির বাইরে ডায়নোসর হাসবে। আমার নিজের ধারণা, আন্তর্জালের মাধ্যমে — আজকের আন্তর্জাল নয়, এ মুহূর্তে অকল্পনীয় তার কোনও উত্তরাধিকারী — হয়তো বার্তা ও মত বিনিময়ের একটা মোটের উপর সমতল, সার্বজনীন, যথার্থ সংলাপভিত্তিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এটা হচ্ছে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক সম্ভাবনা, best case scenario, কারণ তা সম্ভব হবে এই কারণেই যে আন্তর্জালে সব কিছুই স্থান পায় — ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান, বৃহত্তর স্বার্থ ও বৃহত্তম জনস্বার্থ (এবং সেই জনস্বার্থের যথার্থ রক্ষাকবচ, সমাজের প্রত্যেক সদস্যের একক ব্যক্তিস্বার্থ) — এক কথায় সবরকম ভিন্নতা ও বৈপরীত্য। আন্তর্জাল তো কোনও সংহত নির্মাণ নয়, একটা বিশাল ক্ষেত্র মাত্র — ভবন নয়, ময়দান; নগরও নয়, অরণ্য। কোনও বিশেষ সাইটের যাই উদ্দেশ্য থাক, সমগ্র আন্তর্জালের কোনও উদ্দেশ্য বা বক্তব্য নেই। এটাই একাধারে তার শক্তি ও তার দুর্বলতা। এও তো ঠিক, যে নতুন মাধ্যমগুলির ভীতিপ্রদ দিক তুলে ধরলাম, তাও আন্তর্জাল মারফৎ আমাদের কাছে সরবরাহ হচ্ছে ঃ সরবরাহ করছে সাবেক বহুজাতিক বা বিশ্বায়িত সংস্থাগুলির চেয়েও নেপথ্য দূরস্থিত (ভৌগোলিক অর্থে হয়তো সত্যি-সত্যি ঠিকানাহীন) প্রস্তুতকারক। তাদেরও নেপথ্যে আছে গোটা আন্তর্জাল জগতের বিধাতা, কল্যাণকর তবু দানবীয় কিছু সার্ভার আর সার্চ এঞ্জিনের নিয়ন্ত্রক।

ভরসা এটুকুই, শেষ অবধি আমাদের মাউস আমাদের হাতে। আন্তর্জালের অরণ্যে লুকানোর জায়গার অভাব নেই, আবার দুনিয়া চষে জয় করার রাস্তাও খোলা আছে। ভয় কাটার অবকাশ নেই, তবু আশা করা যায় সমাজ, সংবাদ, সংলাপ — শেষ বিচারে সব কিছুই আমাদের দখলে আছে ও থাকবে।

http://medianest.org.in